মারীর খেলাঘর। ইবোলায় মৃত মানুষদের গণকবর। লাইবেরিয়া, ২০১৫

মারী নিয়ে ঘর করি

অরুণাভ সেনগুপ্ত

মানবসভ্যতার উপর ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়েছে একাধিক মারীর প্রকোপ। চিরস্থায়ী ছাপ রেখে গেছে তার ইতিহাসে। কোভিড-১৯ এর ক্ষত কত গভীর, তা এখনও বলা যাচ্ছে না।

‘আমার জন্য কেঁদো না। আমার চারপাশে যে অসংখ্য মানুষ বিষাক্ত অসুখে মারা যাচ্ছে তাঁদের কথা ভাবো’— রোমান সম্রাট মারকাস অরিলিয়াস আন্তনিনাসের শেষ অনুবন্ধ। ইউজিন দেলাক্রোয়ার বিখ্যাত ছবি আছে, মৃত্যুশয্যায় সম্রাট, পাশে পুত্র কমোডাস ও সম্রাটের দার্শনিক বন্ধুরা। অনুবন্ধের কারণ এক দীর্ঘ মহামারী, আন্তনাইন প্লেগ (১৬৫-১৮০ খ্রিস্টাব্দ)। সমসাময়িক চিকিৎসক গ্যালেনের বর্ণনা অনুযায়ী রোগটা আসলে বসন্ত। পারথিয়ান যুদ্ধ-ফেরত রোমান সৈনিকদের বয়ে আনা যে-মহামারী শেষ পর্যন্ত ঘুণ ধরিয়ে দিল রোমান সাম্রাজ্যের ভিতে। ইতিহাস মোড় নিল আর-একভাবেও। রোগাক্রান্ত পরিত্যক্ত মানুষের সেবায় হাজির হলেন, লুকিয়ে, নতুন এক মানবধর্মের প্রচার করা একদল লোক। রোমান নাগরিকদের সঙ্গে খ্রিস্ট উপাসকদের আত্মিক সম্পর্ক স্থাপনের সেই শুরুরই পরিণতি পাশ্চাত্য সভ্যতার খ্রিস্ট উপাসনায়। সংক্রামক রোগ ইতিহাসের গতিপথ বহুবারই পালটেছে। ইউরোপীয়দের নিয়ে যাওয়া বসন্ত আর প্লেগে রেড ইন্ডিয়ান উপজাতিরা যদি ফৌত না হয়ে যেত অথবা উল্টোদিক থেকে তাহিতির ইয়েলো ফিভারে কাবু সৈন্যদলকে হারিয়ে নেপোলিয়ন যদি লুইজিয়ানা বিক্রি করতে বাধ্য না হতেন, আমেরিকার ইতিহাস হয়তো অন্যরকম হত।

বসন্ত, হাম, ম্যালেরিয়া, প্লেগে অকালমৃত্যুতে বারে বারেই বদলেছে নানা রাজশক্তির উত্থান ও পতনের গল্প, যা আধারিত হয়েছে পরস্পরের হাত ধরে চলা দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, আর মহামারী নিয়ে সাধারণ মানুষের আরও এক বড় গল্পে। তার স্মৃতি যেমন আমাদের সামগ্রিক চেতনায় আছে, তেমনই আমাদের শরীরেও, জিনোমে, পুরনো লড়াইয়ের চিহ্ন নিয়ে, বংশগতির বিবর্তিত নির্দেশ নিয়ে হাজির আছে। জানা উদাহরণ, আফ্রিকার ম্যালেরিয়া-প্রবণ অঞ্চলের কিছু অধিবাসীদের ম্যালেরিয়া-প্রতিরোধী জেনেটিক বৈশিষ্ট্য। যে-কোনও রোগের, বিশেষত গোষ্ঠী সংক্রমণ ঘটায় এমন রোগের, প্রকৃতি নিয়ে কোনও ব্যাখ্যান তাই একসঙ্গে জীববিজ্ঞান ও সামাজিক ইতিহাস। যেমন ভবিষ্যৎ দর্শন, তেমনই অতীত স্মরণ। আলোচ্য বিন্দুগুলি হতে পারে রোগের ধাক্কায় সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের চেহারা, সমসাময়িক ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্ক, প্রচলিত চিকিৎসাশাস্ত্রের পরিমার্জন। অথবা প্রকোপকালে আক্রান্ত জনসমষ্টির প্রতিক্রিয়া। মুশকিল হচ্ছে, সব উত্তর কালনির্ভর। মহামারীটি সাম্প্রতিক হলে দরকারি তথ্যগুলোর একটা মোটামুটি সর্বজনগ্রাহ্য প্রতিষ্ঠা পাওয়ার আগে সঠিকভাবে কিছু বলা মুশকিল, বিশেষ করে এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ‘তৈরি’ সংবাদের যুগে, যাতে রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে শেয়ার বাজারে দাম বাড়াতে চাওয়া বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, সবাই শামিল।

আলোচনাটা তাই চার নম্বর বিন্দুটা, সমষ্টিগত প্রতিক্রিয়া থেকে শুরু করা যেতে পারে কারণ, সেটা দৃশ্যমান এবং সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার মধ্যে। সেটা এককথায় ভয় বা নানারকম ভয়ের সমষ্টি। অদৃশ্য অণুজীবের দ্বারা বিনষ্ট হবার ভয়। যারই একটা বিকারগ্রস্ত বহিঃপ্রকাশ স্বাস্থ্যকর্মীদের একঘরে করার চেষ্টা। ‘ছুঁয়ে দিলেই জাত যাবে’ এই বাক্যাংশের মধ্যে লুকিয়ে আছে উত্তর-পশ্চিম ভারতে আগত আর্যদের দক্ষিণ ও মধ্য ভারতের আদি অধিবাসীদের ‘রক্তের অন্তর্গত অণুজীব’ থেকে সংক্রমণের ভয়, এ ব্যাখ্যাটাও কেউ কেউ দিয়েছেন। জীবাণু-বিজ্ঞানের জন্মের আগে থেকেই ছোঁয়াচে অসুখের ধারণাটা যে বিদ্যমান ছিল তার প্রমাণ মেলে সব সভ্যতাতেই মৃতদেহ সৎকারের নানা নিয়ম, অশৌচ, শব ব্যবচ্ছেদ নিষিদ্ধ রাখা ইত্যাদি প্রথার মধ্যে, অথবা প্লেগ বা বসন্তে মৃতের দেহ শত্রুশিবিরে ফেলা আসার ঘটনায়। সমস্যা হল, ভয়ের সঙ্গে খুব সহজেই মিশে যায় অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার। খুবই চিত্তাকর্ষক যে-ভাবে ফ্রান্সের ধর্মপ্রাণ রাজা ফিলিপের নিয়োজিত মেডিক্যাল কমিশন তাঁদের অক্টোবর ১৩৪৮-এর প্রতিবেদনে প্লেগের কারণসমূহকে আশু ও জাগতিক এবং দূরবর্তী ও স্বর্গীয় এই দু’ভাগে ভাগ করে ধর্ম এবং বিজ্ঞানকে মেলাবার চেষ্টা করেছেন। জাগতিক কারণ জল, বায়ু, পরিবেশের দূষিত হওয়া। আর স্বর্গীয় কারণ ১৩৪৫ সালের ২০ মার্চ মধ্যাহ্নের ঠিক একঘণ্টা পূর্বে কুম্ভ রাশিতে শনি, মঙ্গল ও বৃহস্পতি তিনটি গ্রহের একত্র হওয়া। অন্ধকার যুগে চার্চ ও খ্রিস্টধর্মের দ্বারা সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন ইউরোপে এক পাদুয়াবাসীর প্লেগের বর্ণনা, যেখানে মৃত্যুভয়ে স্বামী স্ত্রীকে ছেড়ে বা স্ত্রী স্বামীকে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, ড্যানিয়েল ডিফোর লেখা ‘জার্নাল অফ এ প্লেগ ইয়ার’-এ (সময়কাল ১৬৬৫, প্রকাশ ১৭২২) বিভিন্ন জনপদের আতঙ্কিত মানুষদের তাড়নায় কয়েকটি পরিবারের জঙ্গলে লুকিয়ে লুকিয়ে লন্ডন থেকে দূরে যাবার চেষ্টার বর্ণনা, বঙ্কিমের ‘‘বসন্তের বড় প্রাদুর্ভাব হইল। গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়, কে কাহাকে স্পর্শ করে। কেহ কাহার চিকিৎসা করে না; কেহ কাহাকে দেখে না; মরিলে কেহ ফেলে না’’ বা আহমেদ আলির লেখায় ১৯১৮-র স্প্যানিশ ফ্লু-র সময়ে দিল্লির পাড়ায় পাড়ায় শুধু মানুষের কান্নার আওয়াজ, সৎকার করার লোক নেই, হিন্দুরা কোনওক্রমে লাশ জ্বালিয়ে দিচ্ছে, মুসলমানদের অবস্থা আরও শোচনীয়, গোর দেবার জায়গা না পেয়ে লাশ ফেলে পালাচ্ছে বাড়ির লোক— এ সবই একই ভয়ের বর্ণনা। ভয়টা শেওড়াগাছ থেকে পেত্নি নেমে আসার ভয় নয় অবশ্য। ভয়টা গ্রামবাংলার অশিক্ষা ও অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে লড়াই করা ‘পণ্ডিত মশাই’ বৃন্দাবনের ভয়ের মতো। যে ওলাওঠার মড়া পুড়িয়ে এসে সন্তানের মুখের দিকে চাইতেই ভয়ে কুঁকড়ে যায়, কেবলই মনে হয় এই বুঝি ‘সন্তানের দেহে মরণ বীজ পরিব্যাপ্ত করিয়া দিল’। আজকের সমাজেও ওই একই মরণবীজ পরিব্যাপ্ত হবার ভয় যথেষ্ট ক্রিয়াশীল। যথেষ্ট পরিমাণে সেই অজানার ভয় না থাকলে খালি বৈজ্ঞানিক কারণে হয়তো দেশ-জোড়া তালা-বন্ধ অবস্থা সম্ভব হত না। এপিডেমিকস অ্যাক্ট অফ ইন্ডিয়া ১৮৯৭-এর কারণ যে-বম্বে প্লেগ, তার নিয়ন্ত্রণে কড়াকড়ি করার জন্য সরকারি অধিকর্তা মিঃ র‍্যান্ডকে গুলি করে মেরেছিল পুনার চাপেকার ভাইরা। তবে মহামারীতে আমাদের দেশীয় সামাজিক প্রতিক্রিয়ার তথ্যনির্ভর একটা উপযুক্ত বর্ণনা, যার শুরুটা ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক কারণে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকেই হওয়া উচিত, তা নির্মাণ বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তার কারণ তৎকালে প্রকাশিত লেখার দুর্লভতা। বঙ্কিম বাংলা ১১৭৬ বা ইংরাজি ১৭৭০-এর কথা বলছেন, লক্ষণীয় উনি একসঙ্গে চারটি সংক্রামক রোগের কথা বলেছেন। জ্বর, ওলাওঠা, ক্ষয়, বসন্ত। জ্বর মানে কি ইনফ্লুয়েঞ্জা, কালাজ্বর, না ম্যালেরিয়া? ওলাওঠা বা কলেরার সংক্রমণটি ১৮১৭-র কুখ্যাত এশিয়াটিক কলেরা মহামারীর পূর্বগামী কোনও ঘটনা বা তা অন্য কোনও পেটের অসুখ (ওলা অর্থাৎ দাস্ত, ওঠা বমন)! কলেরা, প্লেগ, ম্যালেরিয়া ইত্যাদির প্রকোপ বেশি হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে। সে জন্যই হয়তো মা শীতলার মূর্তি বা মন্দির থাকলেও কলেরা বা প্লেগের কোনও দেবতা নেই, মন্দির নেই (এক এলোকেশী নারী হিসাবে হিন্দুদের ওলা দেবী বা ওলাই চণ্ডী বা মুসলিমদের ওলাবিবির কল্পনা নিতান্তই স্থানীয়, একটি মন্দির নির্মাণের পিছনে এক পেটরোগা সাহেবের বদান্যতার গল্প আছে)। ‘চতুরঙ্গ’-তে প্লেগ বা ‘পুরাতন ভৃত্য’-তে বসন্ত রোগের কথা থাকলেও রোগটা গৌণ, চরিত্র নির্মাণে সাহায্যকারী। তারাশঙ্কর, বনফুল, বিভূতিভূষণেও তাই, মহামারীর উপস্থাপনা প্রায় ক্ষেত্রেই পটভূমিতে। গবেষকদের তথ্যের উৎস ১৮৩০-এর পরে প্রকাশিত নানা সাপ্তাহিক-মাসিক পত্রিকায় স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রবন্ধ, ‘চিকিৎসা সম্মিলনী’ বা ‘চিকিৎসা সমাচার’ জাতীয় পত্রিকা, আর ডাক্তারি জার্নাল। সেখানেও, এ প্রবন্ধের যে মূল বিষয় ‘ইনফ্লুয়েঞ্জা জাতীয় অসুখ’ (Influenza Like Illness, ILI) খুবই কম আলোচিত। ১৯১৮তে এক ভয়ানক ফ্লু-তে দেড় কোটি ভারতীয়র মৃত্যুও এক পুরোপুরি বিস্মৃত অধ্যায়। এমনকী রবীন্দ্রনাথ বা গাঁধীজি, দুই প্রত্যক্ষদর্শী কেউই এই মহামারীকে আলোচনায় বা সাহিত্যে প্রাপ্য স্থান দেননি। তথ্যের খাতিরে বলতে হয়, রবীন্দ্রনাথের ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল ১৯২৪-এ (আর্জেন্টিনায়), গাঁধীজির ১৯৪৫-এ।

বর্তমান SARS-CoV-2 ভাইরাসজনিত কোভিড-১৯ মহামারীর গল্পটা এখনও অসমাপ্ত হলেও, বোঝাই যাচ্ছে এ এক বেনজির ঘটনা। ঘটনাটা বোঝার আগে জীবাণু-মানুষের সম্পর্কের জানা গল্পটার কিছু সারাৎসার স্মর্তব্য। সম্মিলিত বয়সে, সংখ্যায়, জৈব পদার্থের ওজনে, এমনকী জিনের সংখ্যায় ও বৈচিত্রে জীবাণুরা সমগ্র মানব জাতির থেকে বহুগুণে বেশি তো বটেই, মানবশরীরেই মানবকোষের থেকে জীবাণুকোষের সংখ্যা বেশি। জীবাণুদের মধ্যে আছে ‘ভাইরাস’ (ল্যাটিন শব্দ, বিষাক্ত অর্থে) যা শুধুমাত্র কিছু প্রোটিন আর জেনেটিক সংকেতের সমষ্টি এক আধা-জীব, যাদের জীবনচক্র ও বিবর্তনের পূর্ণতা পেতে দরকার অন্য প্রাণিকোষের রাসায়নিক কলকৌশল। লক্ষ বছরের নৈকট্যের সূত্রে মানবদেহের প্রতিরক্ষা দপ্তরের তথ্যভাণ্ডারে এদের অনেকের পরিচয় মজুত রয়েছে। শত্রু মিত্র চিনতে ভুল হয় না। কিন্তু দূরের বনে অরণ্যের অপরিচিত জীবাণুরা অরণ্য ধ্বংস আর নগর বিস্তারের ফলে ক্রমশ মানুষের কাছাকাছি আসছে। একটা সময়ে তাদের কেউ কেউ মানবকোষে ঢুকে তার সাহায্যে সংখ্যাবৃদ্ধি করছে, এক মানুষ থেকে আরও মানুষে ছড়িয়ে পড়ার ক্ষমতা অর্জন করে ফেলছে। পশ্চিম আফ্রিকার গিনি-র এক বন-কাটা বসতে বাড়ির সামনের মাঠে গাছের নীচে খেলা করত দু’-বছরের এমিলি, যেখানে পড়ে থাকত বনের আশ্রয়হারা বাদুড়ের আধ-খাওয়া ফল। বাদুড়ের শরীরে থাকা মারাত্মক ইবোলা ভাইরাসের সংক্রমণে মারা গেল প্রথমে

ARCHIVE

এমিলি, ক্রমশ তার পরিবার, গ্রাম, শেষপর্যন্ত তিনটি দেশ জুড়ে কয়েক হাজার লোক। বিভিন্ন ভাইরাসের অসুস্থ করার ক্ষমতা এবং একজন মানুষ ক'জন মানুষকে সংক্রামিত করতে পারেন (সংক্রমণ সূচক বা R0 নম্বর দিয়ে বলা হয়) আলাদা। ইনফ্লুয়েঞ্জার R0 ১.৪, কোভিড-১৯ এর R0 ২-৩, হামের R0 ১০-১২। এ সব নব উদ্ভূত জীবাণুদের থেকে অচিরেই আর একটা মহামারী অনিবার্য ধরে নিয়ে সন্দেহভাজনদের একটা তালিকাও প্রস্তুত করেছিলেন বিজ্ঞানীরা, যার শীর্ষে ছিল নানা প্রজাতির দেহে বাস করা ইনফ্লুয়েঞ্জা A বংশীয় কোনও ভাইরাস (ল্যাটিন 'ইনফ্লুএনশিয়া' শব্দ থেকে, যার মানে প্রভাব। এ ক্ষেত্রে দূষিত বাতাসের প্রভাব)। কেবল রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (আর এন এ) সমন্বিত ভাইরাসটির শরীরের উপর তলে থাকা দু'টি গ্লাইকোপ্রোটিন, ১৮টি সাব টাইপের হিম্যাগ্লুটিনিন (H), এবং ১১টি সাব টাইপের নিউর‍্যামিনিডেজ (N), বিভিন্নভাবে যুক্ত হয়ে তৈরি করে H1N1, H2N1, H2N2, H3N3, H5N1 ইত্যাদি ১৩৮ ধরনের ইনফ্লুয়েঞ্জা। A ভাইরাস আবার ক্রমাগত নিজেদের মিউটেট করে নতুন নতুন বংশধারা তৈরি করে (জেনেটিক ড্রিফট), ফলে বসন্ত বা হামের মতো ইনফ্লুয়েঞ্জার বিরুদ্ধে শরীরে চিরস্থায়ী প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে না। টিকাও প্রতিবছর আলাদা করে নিতে হয়। প্রতিবছর অচেনা রূপে হাজির হয়ে স্বাভাবিক বছরগুলিতেই ইনফ্লুয়েঞ্জা ২৬০০০০-৫০০০০০ মৃত্যু ঘটায়। কখনও একাধিক ধারা একই সঙ্গে কোনও দেহকোষে হাজির হয়ে নিজেদের জিনগুলি দেওয়া-নেওয়া এবং পুনর্বিন্যাস করে নতুন ভাইরাসের সৃষ্টি করে (জেনেটিক শিফট)। ২০০৯-এ যেমন চারটি বিভিন্ন বংশগতির ধারা মিলে— তাদের মধ্যে দুটো এসেছিল শূকরের শরীর থেকে— তৈরি হল নতুন ভাইরাস H1N1pdm/09, যা ১৯১৮-র H1N1 থেকে আলাদা। ইনফ্লুয়েঞ্জা জাতীয় জ্বরের প্রথম উল্লেখ খ্রিস্টপূর্ব ৪১২ সালে, গ্রিসে। ১৬৫০ থেকে নথিবদ্ধ প্রায় সব সংক্রমণের উৎপত্তি চিন অথবা চিন-সীমান্তবর্তী রাশিয়া (১৭২৯, ১৮৮৯) থেকে। ১৯১৮-র স্প্যানিশ ফ্লু-র উৎপত্তি নিয়েও একটা প্রচার আছে যে, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যে-লক্ষাধিক চিনা মজুরকে কানাডা হয়ে ইউরোপে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাদের যাত্রাপথ ধরেই রোগটা ছড়িয়েছিল। ২০০৯-এ সোয়াইন ফ্লু-র উৎপত্তিস্থল মেক্সিকো হলেও এক চিন-ফেরত ব্যবসায়ীই প্রথম আক্রান্ত, এ রকম সন্দেহ আছে। এবারের রোগটার উৎপত্তি চিনের উহান শহরে। ভাইরাসটি SARS CoV-2, একটু আলাদা বংশ ও গোত্রের। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে মুকুটের (ল্যাটিন করোনা) মতো দেখতে বলে নাম করোনাভাইরাস। এটাও আর এন এ ভাইরাস, রোগ লক্ষণেও মিল আছে, তাই 'ইনফ্লুয়েঞ্জা জাতীয় অসুখ'-এর মধ্যেই পড়ে। আলফা, বিটা, গামা, ডেলটা, মূলত এই চার ধরনের করোনা ভাইরাসের মধ্যে আলফা এবং বিটা মানুষের বা স্তন্যপায়ী প্রাণীর শরীরে সংক্রমণ ঘটায়, যাদের আবার ৭টি প্রজাতি আছে। তাদের মধ্যে ৪টি সাধারণ সর্দি-কাশি ঘটায়, তবে ৩টি বড় সংক্রমণ ঘটিয়েছে। প্রথম ২০০২-৩-এ সার্স করোনা ভাইরাস (SARS CoV) থেকে সিভিয়ার রেসপিরেটরি সিনড্রোম। উৎপত্তি চিনের সুন্দে শহর, আক্রান্ত ৮০৩৪, মৃত ৭৭৪, মৃত্যুর হার ৯.২%। সংক্রমণ প্রশমনে কয়েকটা ব্যাপার সাহায্য করেছিল, যেমন, সংক্রমিত ব্যক্তিদের দ্রুত হাসপাতালে উপস্থিত হওয়া; অসুস্থ হওয়ারও ৫/৭ দিন পর রোগীদের সংক্রামক হওয়া, আর ২০০১-এ ৯/১১ হামলার জন্য চালু অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা। দ্বিতীয় মারাত্মক রোগ মার্স (MERS) বা মিডল ইস্ট রেসপিরেটরি সিনড্রোম। উৎপত্তি সৌদি আরবের জেড্ডা শহরে, প্রাদুর্ভাব ২০১২, ২০১৫, ২০১৮য়। মোট আক্রান্ত ২৪৯৪, মৃত ৮৫৪, মৃত্যুর হার ৩৭%। রোগটি মারাত্মক, কিন্তু মানুষ থেকে মানুষে সংক্রমণের হার খুব কম বলে রক্ষে পাওয়া গিয়েছে। তৃতীয়টিই SARS CoV-2 থেকে জাত বর্তমান অসুখ, কোভিড-১৯। সার্সের দ্বিতীয় সংস্করণ হলেও এটি অনেকটাই অজানা, এবং ফ্লু-র তুলনায় মারাত্মক। আগেই লিখেছি, ফ্লু-র R0 ১.৪, করোনার R0 ২-৩, ফ্লু-র রোগী ২/৩ দিনের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়ে, করোনা রোগীর সংক্রমণের পরেও উপসর্গ দেখা দিতে ১৪ দিন পর্যন্ত লেগে যায়। উপসর্গ দেখা দেবার ৪৮-৭২ ঘণ্টা আগে থেকে একজন সংক্রমিত ব্যক্তি ভাইরাস ছড়াতে পারে, যা সার্সের একেবারেই উল্টো। ফ্লু-র মৃত্যুর হার ০.১ শতাংশ, কোভিড-১৯ এর ২-৩ শতাংশ, ফ্লু-র কিছু ওষুধ ও ভ্যাকসিন আছে, কোভিড-১৯-এর কিছুই নেই। অনেক ঘটনার সন্তোষজনক ব্যাখ্যাও পাওয়া যাচ্ছে না। বিভিন্ন দেশে মৃত্যুর বিভিন্ন হার যেমন। খাদ্যাভ্যাস, জাতিগত বৈশিষ্ট্য, জনঘনত্ব, নগরায়ণ, অর্থনৈতিক অবস্থা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কোনওটাকেই আলাদা করা যাচ্ছে না একমাত্র পর্যটকের হার ছাড়া।

নতুন শক্তি আহরণ করে যদি আগামী অক্টোবরে ১৯১৮-র মতো দ্বিতীয় ঢেউ আসে, অপরিকল্পিতভাবে এখনই সব শক্তি শেষ করে ফেললে তখন কী হবে? ভ্যাকসিনের ব্যাপারেও অনেক কিন্তু আছে।

তবে গত একশো বছরে ইনফ্লুয়েঞ্জা জাতীয় অসুখগুলি বা চারটি বড় মহামারীর (১৯১৮, ১৯৫৭, ১৯৬৮, এবং ২০০৯) গতিপ্রকৃতি থেকে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট। ১) রোগ সংক্রমণের বিস্তারের গতি ও আয়তন পর্যটনের উপর নির্ভরশীল; ২) প্রত্যেকটা মহামারী উপর্যুপরি ঢেউয়ের আকারে এসেছে, অনেক সময়ে পরের ঢেউটাই তুলনায় তীব্রতর; ৩) সংক্রমণের আকার বাড়লেও মৃত্যুর হার ক্রমশ কমেছে; ৪) তরুণদের মধ্যে আক্রান্ত বা মৃত্যুর হার কম, এ সাধারণ ধারণাটা সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। স্প্যানিশ ফ্লু এবং সোয়াইন ফ্লু, দুটোতেই তরুণদের সবল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার তোলা ঝড়ে উল্টো বিপত্তি হয়েছে; ৫) এই প্রত্যেকটি মহামারী হয়েছে একটা নভেল বা মানবদেহের অচেনা ভাইরাস থেকে। ১৯১৮-এর স্প্যানিশ ফ্লু, ভাইরাস টাইপ H1N1, মৃত ৫ থেকে ১০ কোটি; ১৯৫৭-র এশিয়ান ফ্লু, ভাইরাস টাইপ H2N2, মৃত ২০ লক্ষ; ১৯৬৮-র হংকং ফ্লু, ভাইরাস টাইপ H3N2, মৃত ১০ লক্ষ; ২০০৯ সোয়াইন ফ্লু, ভাইরাস টাইপ H1N1/09, মৃত ২ লক্ষাধিক। ১৯৬৮-র H3N2 ভাইরাসটি ১৯৫৭-র H2N2 ভাইরাসটিরই বদলে যাওয়া রূপ বলে যেমন ইমিউনোলজিক্যালি একেবারে অচেনা ছিল না তেমনই ভিয়েতনাম ফেরত সৈন্যরা দ্রুত ছড়িয়ে দিয়েছিল সোজা আমেরিকায়, ইউরোপ পেরিয়ে। ১৯১৮-র স্প্যানিশ ফ্লু-র প্রেক্ষিত অবশ্য সম্পূর্ণ আলাদা। ফ্ল্যান্ডারসের কর্দমাক্ত নোংরা গ্যাস-ভর্তি পরিখাগুলিতে লক্ষ লক্ষ অধৌত অস্নাত গা ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকা সৈন্যদলের শরীরে ভাইরাসরা পেয়ে গিয়েছিল বংশবৃদ্ধি ও মৃগয়ার অবাধ ক্ষেত্র। খবরটা যুদ্ধরত দেশরা চেপে গেলেও ফাঁস করে দেয় যুদ্ধে যোগ না দেওয়া স্পেনের সংবাদমাধ্যম, যে-কারণে স্প্যানিশ ফ্লু-র নামকরণ। স্প্যানিশ ফ্লু-তে দেড় কোটি মৃত্যু ছাড়া ভারতীয় উপমহাদেশে ১৯৫৭, ১৯৬৮, ২০০৯-এর ফ্লু মহামারীর প্রভাব তুলনায় অনেক কম, বিশেষ করে আমাদের বাংলায় যেখানে শুধু ১৯৫৭-তে চার শতাধিক মৃত্যু ভারতে (১০৩৪) সর্বাধিক। সংখ্যার হিসাবে ভারতে ২০০৯-এর সোয়াইন ফ্লু-র (১,৮৩,২০৭ পরীক্ষা, ৪৩২৮৩ রোগাক্রান্ত, ২৪২৭ মৃত) প্রভাবই সবচেয়ে বেশি। মনে রাখতে হবে, মৃত্যুর ঘোষিত সংখ্যা সাধারণত বাস্তব সংখ্যার থেকে অনেক কম। সবার পরীক্ষা হয় না। অনেকেরই বাড়িতে মৃত্যু হয়। সঠিক চিত্রটা জানতে বৈজ্ঞানিকরা কম্পিউটার মডেলিং এবং নানা ধরনের অপ্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করেন। ২০০৯-এ পরীক্ষায় প্রমাণিত মৃতের সংখ্যা ১৮৫০০, আসল সংখ্যা ২ লক্ষ।

আর-একটা ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী অবধারিত এবং তা সম্ভবত মারাত্মক H5N1 টাইপ, এমনটা ধরে নিয়ে ২০০৯-তে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতায় প্রত্যেকটা দেশই বিস্তারিত

‘ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী প্রতিরোধ পরিকল্পনা’ তৈরি করেছিল। যার চারটি উপাদান: ১) চিকিৎসা সম্পর্কিত ব্যবস্থা যেমন আইসিসিইউ, ভেন্টিলেটর ইত্যাদি; দ্রুত রোগ নির্ণায়ক পরীক্ষার সরঞ্জাম ও ভ্যাকসিন তৈরি; এবং পর্যাপ্ত ভাইরাস-প্রতিরোধী ওষুধ মজুত; ২) স্বাস্থ্যকর্মীদের ব্যক্তিগত প্রতিরোধ পোশাক ও অন্যান্য ব্যবস্থা; ৩) সংক্রামিত ব্যক্তিদের চিহ্নিত এবং অন্তরীণ করা, যাতায়াত, সমাবেশ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি প্রশাসনিক ব্যবস্থা; ৪) ব্যাপকভাবে জনসাধারণের মধ্যে হাত ধোয়া, মুখ ঢাকা, স্পর্শ এড়ানো এ সব অভ্যাসের প্রচলন। নানা সম্ভাব্য পরিস্থিতি কল্পনা করে প্রতিটি দেশ আলাদা পরিকল্পনা তৈরি করল। ধনী দেশরা জোর দিল পরিকাঠামো তৈরি, ওষুধ ও সরঞ্জাম মজুত এবং দ্রুত ভ্যাকসিন আবিষ্কারের উপর। আমেরিকার প্রকাশিত নথিতে (২০১৭) এটা স্পষ্ট যে, মধ্যম তীব্রতার সংক্রমণে কয়েক লক্ষ লোক মারা যাবে ধরে নিয়েও তারা মানুষকে তালাবন্ধ করার বিপক্ষে। ইংল্যান্ডে প্রায় তিন লক্ষ মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে ধরেও ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের প্রকাশিত নীতি-নথিতে কাজ কর্ম চালিয়ে যাবার (বিজনেস অ্যাজ় ইউজুয়াল) কথাই বলা হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও তাঁদের শেষ (২৯ ফেব্রুয়ারি) পরামর্শ বা নির্দেশনামায় বলেছিল, ‘বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এখনও কোভিড আক্রান্ত দেশগুলিকে আন্তর্জাতিক ভ্রমণ ও ব্যবসা নিষিদ্ধ ও নিয়ন্ত্রণ না করার পরামর্শই দেবে।’ অনুমান করি এ রকম বিশ্ব-বন্ধ্ বোধ করি কারও পরিকল্পনাতেই ছিল না, কারণ থেমে থাকা পৃথিবীতে না খেতে পেয়ে বা অন্য সব অসুখের বিনা চিকিৎসায় মোট মৃতের সংখ্যা মহামারীতে মৃতের সংখ্যার চেয়ে বেশিও হতে পারে। তুলনায় বেশি কাম্য ছিল সংক্রমিত ব্যক্তিকে দ্রুত চিহ্নিত করা, সংস্পর্শে আসা সবাইকে অন্তরীণ করা, ও সংক্রমিত জায়গাটিকে ঘের-বন্দি রাখা। অবস্থাটা পালটে দিল চিনের একটা গোটা প্রদেশকে ঘর-বন্দি করে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের দৃষ্টান্ত ও এই উপলব্ধি যে, এটা একটা এতাবৎ অজানা ভাইরাস, যার উন্মেষকাল এবং R0 আলাদা, পরীক্ষাপদ্ধতি এবং প্রতিষেধক আবিষ্কারে সময় লাগবে। এই সময়ের মধ্যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটাই ভেঙে পড়তে পারে। উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম সুইডেন, জাপানের মতো দেশ, নিজেদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং স্বাভাবিক জাতিগত শৃঙ্খলায় তারা ভরসা রাখতে পেরেছিল। রাষ্ট্রনায়কদের ব্যক্তিত্ব বা পূর্ব-অভিজ্ঞতা অনুসারে দেশে দেশে কীভাবে নীতিগুলো আলাদা রং নিল তা নিবিড়ভাবে লক্ষণীয়। শিক্ষিত বিজ্ঞানী জার্মানির মারকেলের একেবারেই উল্টো পথে হাঁটছেন পূর্বতন সামরিক আধিকারিক ব্রাজিলের বোসুনারু। শেষ পর্যন্ত কোন দেশের কী হাল হবে তা বুঝতে আরও কিছুদিন সময় লাগবে। ২০০৯-এর সোয়াইন ফ্লু-র অভিজ্ঞতাই ভারতীয় ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর প্রতিরোধ পরিকল্পনার (পুনে প্ল্যান) ভিত্তি। গত কয়েক বছরে তার নতুন কী পর্যালোচনা হয়েছে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত দলিল বা নির্দেশনামা অন্য দেশের মতো জনসাধারণের জ্ঞাতব্যে সহজলভ্য নয়। কী হতে চলেছে তার বৃত্তান্ত বা সরকারের ভাবনা-চিন্তা জানিয়ে জনগণের আস্থা অর্জন করা, ধাপে ধাপে পরিকল্পনামাফিক কাজ করা, এবং বিকল্প ব্যবস্থা চালু রাখা রাষ্ট্রের কর্তব্য। ভারতে এর আগে সব সময়েই প্রকোপ বেড়েছে অক্টোবর মাসে, দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময়। এবার কী হবে তা বোঝা যাবে করোনাভাইরাস দক্ষিণ গোলার্ধ ভ্রমণ সেরে নতুন শক্তি নিয়ে অথবা শক্তি হারিয়ে কী ভাবে ফিরে আসবে তা দেখার পর। নতুন শক্তি আহরণ করে যদি আগামী অক্টোবরে ১৯১৮-র মতো আবার দ্বিতীয় ঢেউ আসে, অপরিকল্পিতভাবে এখনই সব শক্তি শেষ করে ফেললে তখন কী হবে? ভ্যাকসিনের ব্যাপারেও অনেকগুলো কিন্তু আছে। ঠিক সময়ে আসবে তো! সার্স বা মার্স, অন্য দুই করোনার প্রতিষেধক কিন্তু সময়ে আসেনি। ভারত এর কতটা ভাগ পাবে? বাজার থেকে কেনার ব্যাপারে পশ্চিমা দেশগুলি আগেই বরাত দিয়ে রেখেছে। ভারত যদিও ভ্যাকসিন নিয়ে গবেষণার জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক সংস্থার (CEPI: Coalition for Epidemic Preparedeness Innovation) প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য, কিন্তু আবিষ্কৃত ভ্যাকসিনের স্বত্বাধিকার ও তার বণ্টনের নিয়মকানুন খুবই জটিল। গোষ্ঠী প্রতিরোধ-ক্ষমতা তৈরি করতে করোনার সংক্রমণ সূচক (R0 ২-৩) অনুযায়ী প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষকে ভ্যাকসিন দিতে হবে, যেটা সহজ কাজ নয়। বসন্ত, পোলিও ইত্যাদি ভ্যাকসিন দিয়ে নির্মূল করা সম্ভব, কারণ এর ভাইরাসগুলো মানুষ ছাড়া অন্য কোনও প্রাণীর দেহে থাকতে পারে না। ইনফ্লুয়েঞ্জা বা করোনাভাইরাসের ক্ষেত্রে ঠিক উল্টো। অন্য প্রজাতির মধ্যেই এদের লালনপালন এবং ক্রমাগত চেহারা পালটে মানবদেহে সংক্রমণ। নিয়মিত ভ্যাকসিন নেওয়াটাও আমাদের জাতীয় চরিত্রের মধ্যে পড়ে না। যেখানে সোয়াইন ফ্লু নিয়ে সবচেয়ে বেশি কাজ হয়েছে, সেই পুনের স্বাস্থ্যকর্মীরাই সোয়াইন ফ্লু-র ভ্যাকসিন নেননি।

বাতাসকেও বিশ্বাস নেই। স্প্যানিশ ফ্লু প্রতিরোধের আয়োজন। ১৯১৯

কী হবে? কেমন হবে করোনা-উত্তর পৃথিবী? মেরি শেলির লেখা মহামারীতে বিনষ্ট পৃথিবীতে ‘দ্য লাস্ট ম্যান’-এর গল্প, ‘র‍্যাটস, লাইস অ্যান্ড হিস্ট্রি’ (১৯৩৫) বইতে টাইফাসের টিকা আবিষ্কারক হান্স জিন্সারের (Hans Zinsser) সতর্কবাণী, ‘যতই এগিয়ে যাক সভ্যতা, ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া, টিক, লাইস, ভাইরাস, অগুনতি সংক্রামক জীবাণু এবং তাদের বাহক পোকামাকড়রা যে-কোনও অসতর্ক মুহূর্তে আমাদের উপর লাফিয়ে পড়ার জন্য অপেক্ষা করছে’। তারই প্রতিধ্বনি কাম্যুর ‘দ্য প্লেগ’-এ, ‘প্লেগ ব্যাসিলাস কখনও মরে না, লুকিয়ে থাকে সুযোগের অপেক্ষায়’, এই ভয়ে কি পালটে যাবে পৃথিবী? হয় তো, হয় তো না। জুতা আবিষ্কারের মতো পৃথিবীটাকে ঢাকার বদলে আমরা নিজেদের হয়তো ঢাকতে শিখব। ত্বরান্বিত হবে পঠনপাঠন ব্যবসা বাজারহাট দূর-চিকিৎসা, যা আগেই শুরু হয়েছে, তার প্রযুক্তির উন্নতি ও উদ্ভাবন। যদিও একটা দুর্দান্ত ব্যাপার কিন্তু ইতিমধ্যে ঘটে গেছে। এই প্রথম মন্দির-মসজিদ-চার্চ অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবার মধ্যে পড়ে না বলে বিশ্ব-জুড়ে তালাবন্ধ হয়েছে। সংগঠিত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম ছুটিতে। সৃষ্টিকর্তা বনাম ডারউইনের লড়াইতে ‘অ্যাডভানটেজ ডারউইন’?